বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

বিষয়ঃ- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী ও তাঁর সমাজ সচেতনতামূলক সাহিত্য

গবেষণাধর্মী প্রকল্প

বিভাগ – বি. এ. জেনারেল

পেপার – SEC (4)

নাম – অনিমেষ দাস মাদ্রাজী

শ্রেণী – তৃতীয় বর্ষ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

রেজিঃ – ১১৬০২৬৩, সাল – ২০২০-২০২১

রোল – ১২১৬১১৬ নং - ২০১০৭৫

শিক্ষাবর্ষঃ– ২০২০-২০২৩

Department of Bengali

Haldia Government College

Debhog, Haldia, Purba Medinipur

Ref. No: BNGG/P/2022-2023/10 Date:

Project Completion Certificate

This is to certify that ……………....**Animesh Das Madraji**…………………………..…

with University Registration no…**1160263** of **2020-2021**(session) a student of Semester-**VI** has successfully completed the project work entitled **Iswarchandra Vidyasagarer Jiboni O tar samajsachetanatamulak sahitya**…..for partial fulfillment of B.A.(G) degree in the academic year 2022-2023.

It has been noticed that during the course, the candidate was regular and has a keen interest to the project work.

I wish his every success in life.

21-07-2023

Project Supervisor

Assistant Professor
West Bengal Education Service
Department of Bengali
Haldia Government College

Head, Department of Bengali

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education Service

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে"। পৃথিবীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার অভিপ্রায়ে আমি ষষ্ঠ ষান্মাসিক বিভাগের সাহিত্যের SEC পেপারের জন্য বিদ্যাসাগরের জীবনী ও তার সমাজ সচেতনতামূলক সাহিত্য প্রকল্পটি নির্বাচন করি। এই প্রকল্পটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমার মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের ষান্মাসিক অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগন বিশেষকরে অমিত পাত্র সহ বিভাগীয় প্রধান এবং সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাগন আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে।

তাছাড়াও আমার সহপাঠীগন আমাকে এই প্রকল্পের বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বলা যায় যে আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি যদি বাস্তব অবস্থায় সামান্য হলেও কাজে আসে, তবে এই প্রচেষ্টা আমার সার্থক হয়েছে বলে মনে করব,

Date - 26/07/2023

Animesh Das Madraji

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাসংখ্যা
ভূমিকা	১
বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন	2
শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান	৩
বিদ্যালয় স্থাপন	৩
বিধবা বিবাহ	৩-৫
বাল্যবিবাহ	৫-৬
বহুবিবাহ	৭-৮
নারীশিক্ষার প্রসার	৮-৯
বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কিছু লেখা	১০
বিদ্যাসাগরের পুরস্কার ও সম্মান	১১-১২
জীবনাবসান	১৩
উপসংহার	১৪-১৬
গ্রন্থপঞ্জি	১৭-২৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভূমিকা :-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন ভারতীয় সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ এবং লেখক যিনি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে একটি ছোট গ্রামে ১৮২০ সালে ২৬ শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবতী দেবীর পুত্র ছিলেন তার আসল নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যার অর্থ হলো "জ্ঞানের সাগর", ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চার বছর বয়সে একটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষা শুরু করেন। যেখানে তিনি পড়তে এবং লিখতে শিখেছিলেন তার বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র পুরোহিত। তার পরিবারটি আর্থিকভাবে সংগ্রাম করত। যার ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। যাইহোক তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এবং তার বুদ্ধিমত্তা ছিল প্রবল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন:—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 1839 সালে উচ্চ রংে নিম্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য এবং স্মৃতিবিদ্যা, দর্শন অধ্যয়ন করেন। ১৮৪১ সালে তিনি সংস্কৃত নিম্ন পাশ করেন। তিনি একজন চমৎকার ছাত্র ছিলেন, এবং তার শিক্ষকদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

তিনি শীঘ্রই কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি ছাত্র জীবনে অনেক বই পড়েন এবং তিনি বাংলা সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্য, জ্যোতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করেন। ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাত্রজীবনে কিংবা বিদ্যার জীবনে তার দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিলো, নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করা।

সংক্ষেপে বলা যায় বিদ্যাসাগরের নতুন একটি নত্র সূচনা হয়েছিল। তিনি ভার তীয় ইতিহাসের অন্যতম অন্যতম ব্যাক্তি হিসাবে স্মরণীয়

1856 সালের 16ই জুলাই এই আইন প্রনয়ন করা হয়। এই বিধবাবিবাহ আইন 1856 সালে বাস্তবায়নের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং,

লর্ড ডালহৌসির এই আইনের খসড়া তৈরি করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আইন প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল তথাকথিত পরিবারের সম্মান এবং পারিবারিক সম্পত্তির রক্ষার জন্য এরকম নিয়ম করা হয়েছিল।

লর্ড ডালহৌসি এই আইনের খসড়া তৈরি করেছিলেন. উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রামমোহনের প্রচেষ্টায় অনেক আন্দোলন তিনি করেছিলেন, এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছিলেন, বিদ্যাসাগর বিধবা নারীদের জন্য যে সমস্ত কাজ করে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে,

বিধবা বিবাহ প্রস্তাব বের হবার পর থেকে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কট্টর পন্থীরা ঘোর আন্দোলন করেছিলেন। এই বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর অনেকগুলি ব্যঙ্গের মাধ্যমে পুস্তিকা রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব, রত্ন পরীক্ষা যা সমাজকে বেশি করে উজ্জীবিত করে।

● বাল্যবিবাহ :-

হিন্দুধর্মে মেয়েদের বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য তিনি অনেক সংগ্রাম করেন। তিনি সর্বশুভকরী পত্রিকায় বাল্যবিবাহের দোষ শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশ করে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন।

এ ব্যাপারে তিনি সফল হন। ১৮৬০ খ্রী সরকার আইন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স কম পক্ষে ১০ বছর ধার্য করেন। এছাড়াও বাল্যবিবাহ রোধের জন্য তিনি অনেক লড়াই করেছিলেন। শিশুদের জন্য তিনি বহু লড়াই করেছেন, এছাড়াও তিনি অনেক সামাজিক কাজেও বিরাট অবদান রেখেছিলেন।

বাল্য বিবাহ হলো অল্পবয়স্ক ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক অথবা আইনত বিবাহের বয়স ১৮ বছর বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে। কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে এই বয়সের আগেও বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

যদিও আইন অনুযায়ী বিয়ের বয়স ১৮ বছর তার পরেও কিছু কিছু দেশের নিজস্ব প্রথাকেই আইনের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহ মেয়ে বা ছেলে দুজনের প্রতি প্রভাব পড়ে। তবে মেয়েরাই বেশিভাগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশিরভাগ বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলে মেয়ে দুজনের মধ্যে কমপক্ষে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়।

বাল্য বিবাহের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলত দারিদ্রতা, অশিক্ষা সামাজিক চাপ, মেয়েদের উপার্জনক্ষেত্রে অক্ষম ইত্যাদি বিষয়গুলি বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব ফেলে।

বহুবিবাহ :-

সেযুগে হিন্দু সমাজে পুরুষদের বহুবিবাহ করার অধিকার ছিল। ফলে কুলিন সমাজে এই প্রথার বহু প্রচলন ছিল, ফলে কুলিন সমাজে এই প্রথার বহু চল ছিল, বিদ্যাসাগর এই প্রথার বিরুদ্ধে সরব হন, এবং বিদ্যাসাগর এই প্রথার বিরুদ্ধে সরব হন। এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন,

১৮৭৩ খ্রীঃ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার নামক একটি পুস্তিকাও রচনা করেন, এছাড়াও তিনি সরকারি সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু বহুবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ সম্মান পাননি। এই কারনেই বাল্যবিবাহের প্রচলন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে, এরমধ্যে রয়েছে দারিদ্রতা, নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতার কিছু আশঙ্কা-

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ইত্যাদি দেশে বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলন ছিল।
যাই হোক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত এমনকি ওশিয়ানিয়াতে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। মধ্য আফ্রিকার কিছু দেশে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি যার প্রায় ৬০% এর ওপর। শিশুদের বাল্য বিবাহের হার ২০% এর ওপর।

● নারীশিক্ষার প্রসার :—

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল। এইসময়ে যে সকল মনিষি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা, নারীর অধিকার, নারীশিক্ষার মাধ্যমে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন।

বাংলার পল্লী অঞ্চলে নারী শিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের বিরাট অবদান রয়েছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেননি বাংলার পল্লী অঞ্চলের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তুত ও বিস্তার করেছিলেন। তিনি নিজে ১৮৫৭ সালে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এছাড়া নানা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এইভাবে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন, বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য তিনি অনেক লড়াই করেছেন, এইভাবে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধের জন্য তার অবদান অনস্বীকার্য,

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কিছু লেখাঃ-

i) স্ত্রী শিক্ষার সামাজিক প্রতিষ্ঠান একটি বই যেখানে তিনি স্ত্রীদের শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে।

(ii) বিদ্যালঙ্কার (1894) একটি পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত একটি লেখা যেখানে তিনি শিক্ষার সাথে মনোবৃত্তি সম্পর্ক বিবেচনা করেন,

(iii) সমাজ সংস্কারের উপদেশমালা ১টি গ্রন্থ যেখানে তিনি শিক্ষার সাথে মনোবৃত্তি সম্পর্ক বিবেচনা করেন,

(iv) শিক্ষা এবং সংস্কারক একটি গ্রন্থ যেখানে তিনি শিক্ষার সাথে মনোবৃত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন,

(v) আধুনিক বাঙালির চেতনা একটি লেখা যেখানে তিনি বাঙালি সমাজের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করেন,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুরস্কার ও সম্মান

বিদ্যাসাগর হলো প্রথম বাঙালি যিনি ভাষার সংস্কারণ, সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা, সাহিত্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তার লেখাগুলি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে একটি মূল স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পুরস্কার দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রভৃতি বিভাগের তারকা হিসাবে প্রদান করা হয়। এই পুরস্কারটি তার জন্মবার্ষিকীতে প্রদান করা হয়। তিনি একজন দৈনন্দিন মানবতা এবং সমস্যাগুলির মধ্যে মাতা সমস্যাগুলি উপেক্ষা করে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে সমর্থ করে আসেন। তার লেখাগুলি পরিবার এবং সমাজের ভালোবাসা সংস্কার নির্মাণে পরিণত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৩৯ সালের 22 শে এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় কৃতীত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন, ১৬ই মে ল কমিটির কাছ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি পান

এছাড়াও তিনি ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর প্রচেষ্টা করেছেন যাতে তারা বিদ্যা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সামিল হতে পারে, তিনি একজন উত্তম শিক্ষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও তার শিক্ষার প্রভাব আজও সমাজে অনেক রয়েছে এবং এর মাধ্যমে তিনি আজও বিশ্বব জনগনের হৃদয়ে জীবিত হয়ে বেঁচে রয়েছেন এবং চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

জীবনাবসান :—

বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে অত্যন্ত দুঃখের সাথে কাটিয়েছিলেন, তিনি ১৮৭১ সালের কলকাতার একটি নাটকের প্রয়োজনীয় পূরনের জন্য নাটকে লেখার কাজ করেছিলেন, এই সময়ে তিনি ভীষন দূর্বল হয়ে পড়েন এবং নাটকের লেখার কাজ শেষ না হলেও এরজন্য জ্বর সমস্যায় পড়েন, এরপর তিনি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আশ্রম যান,

কিছুদিন পরে বাংলার নব জাগরনের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিভারের ক্যানসার হয় এবং তারপর ১৮৯১ সালের ২৯ শে জুলাই রাত্রি দুটো আঠারো মিনিটে তার কলকাতার বাদুড়বাগানস্থ বাসভবনে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন,

নারীশিক্ষার প্রসার :—

① বাংলার পল্লী অঞ্চলে নারী শিক্ষার বিস্তার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি সচেতনতার আগ্রহ সৃষ্টি করেনি বাংলার পল্লী অঞ্চলের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্ত করেছিল তিনি নিজে ১৮৫৭ সালে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

② বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি স্মরণীয় কাজ হল বালিকাদের জন্য বেথুন বিদ্যালয় স্থাপন করা তৎকালীন শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি মি. জি. ডব্লিউ বেথুনের সাহায্যে

১৮৪৯ সালে মেয়েদের একটি অবৈতনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যার নাম দেন কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় পরবর্তীকালে বেথুন সাহেবের নামে এই বিদ্যালয়ের নাম দেন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়, এই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা বিনা বেতনে পাঠ্যসূচক হিসাবে বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হত, অন্যান্য

বিভিন্ন হাতের লেখা, সূচী কর্মের শিক্ষা দেওয়া হত, অন্যান্য বাংলা তথা মাতৃভাষা শিক্ষা সকলের জন্য আবশ্যিক হিসাবে ইংরেজি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবেও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল,

③ স্ত্রী শিক্ষাবিস্তারের হ্যালিডেসাহেবের ভূমিকা:

১৮৫৭ সালের প্রথমাংশে বাংলার প্রথম ছোটলাট হয়ে হ্যালিডে সাহেব আসেন। তিনি বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা পান।

হ্যালিডে সাহেবের সাথে একমত হয়ে বিদ্যাসাগর বলেন যে যে গ্রামের অধিবাসীরা বিদ্যালয়ের জন্য স্থান দিতে পারবে সে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে মেদিনীপুর জেলায় ৩টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি হুগলি জেলায় ২০টি নদীয়া জেলায় একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলেন।

নারীশিক্ষাভান্ডার গঠন:—

বিদ্যাসাগর আশা করেছিলেন যে এই বিদ্যালয়গুলি আর্থিক সাহায্য পাবে, কিন্তু বছর ঘুরতে তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারত সরকার আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে অনিচ্ছুক. বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐসব বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য নারীদের জন্য নারী শিক্ষার ভান্ডার নামে একটি ভান্ডার গঠন করেন, যেখানে নারীদের জন্য প্রচুর সুবিধা ছিল,

নারীদের প্রচুর পরিমানে আর্থিক সাহায্য করার কথা পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এছাড়া নারীরা যাতে সমাজে এগিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করেছিল,

⑤ জনশিক্ষার প্রসার :-

সমাজের সকল স্তরের নারীদের জন্য সার্বজনীন জনশিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি জনচেতনার বিকাশ না ঘটানো গেলো বহু বিবাহের মত কুৎসিত প্রথার বিলোপ সাধন করা সম্ভবপর হবে না,

এইভাবে সমাজের সকল স্তরের নারীদের জন্য তিনি বিশাল ভাবনা ভেবেছিলেন, তিনি জনশিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি জনচেতনার বিকাশ না ঘটলে ও বহু বিবাহের মতো কুৎসিত প্রথার বিলোপ সাধন করার সম্ভব ছিল না।

(ঙ) নারীমুক্তি বিধবা বিবাহের সামাজিক বিস্তার

বিধবা বিবাহ প্রস্তাব পেশ হবার পর থেকে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কট্টর সমাজীর জোরে আন্দোলন আরম্ভ করে। এই বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগে— বিদ্যাসাগর কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবতত্ত্ব পরিবেশ, কয়েকটি উপযুক্ত চাইপোকা, যা সমাজকে উজ্জীবিত করে।

পরিবেশে আরোও অনেক কিছু বলা যায় যে নারী ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের মূল্য

মূল করা অসম্ভব, নারীমুক্তি এবং নারীশিক্ষার প্রসারে, বিস্তার তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা যে শুধু ভারতীয়দের শিক্ষা প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা নয়,

তদানীন্তন শিক্ষা শিক্ষার নীতিকে বিশেষ করে প্রভাবিত করে ছিল একজন বিদ্যাসাগরের নাম ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে যা মানুষকে চিরকাল উজ্জীবিত করবে ভবিষ্যৎ জীবনে,

এইভাবে বিদ্যাসাগরের নাম ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে,

বিদ্যাসাগর আরোও কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম অনেক পুস্তিকা রয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ভাইপোষ্য, রত্ন পরীক্ষা, ইত্যাদি যা সমাজের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।

পরিশেষে আরোও কিছু বলা যায় যে নারী এবং স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য, এছাড়া নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রচুর অবদান আছে। নারীদের জন্য সত্যিকারের-জনশিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি জনচেতনার বিকাশ না ঘটানো গেলো বহুবিবাহের মতো কুসংস্কার প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব পর ছিলনা।

এইভাবে বিদ্যাসাগর সর্বক্ষেত্রে তার অবদান রেখে গেছেন যা ভারতীয় সমাজে অমূল্য হয়ে থাকবে।

বিদ্যাসাগরের বহু অবদান আমাদের মনে গেঁথে যাবে। এবং ১৮৩৯ সালের 22 শে এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় কৃতীত্বের সাথে তিনি উত্তীর্ণ হন। এছাড়া ১৮৩৯ সে ল কি কমিটির কাছ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। এছাড়া তিনি অনেক প্রচেষ্টা করেছেন ছাত্রদের উন্নতি ঘটানোর জন্য.

এছাড়া ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর চেষ্টা করেছেন যাতে যাতে তারা বিদ্যা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামিল হতে পারে। তিনি একজন উত্তম শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, এছাড়া সমাজে যে শিক্ষার অভাব রয়েছে সে ক্ষেত্রে তিনি উন্নতি ঘটাতে চেয়ে ছিলেন, তাই বিদ্যাসাগরের অবদান কেউ কোনদিনও ভুলবেনা, তার অবদান অনস্বীকার্য।

উপসংহার

বিদ্যাসাগর ছিলেন যথার্থ মানবতাবাদী, তিনি উদার মনের মানুষ ছিলেন। মানুষের ইহ জীবনে সুখ দুঃখে তিনি ছিলেন খুবই উৎসুক। পরলোক এবং ঈশ্বর সমন্ধে তিনি ছিলেন নীরব এবং নীরুৎসুক। তার কাছে ধর্ম হলো মানবধর্ম।

কর্ম ছিল মানবতার মানব প্রেমের প্রবর্তনায় মানবকল্যানে আত্মনিয়োগ এই দেশের কত মানুষ যে তার কাছে ঋণী তার হিসেব কেউ রাখেনা। বিদেশে অসহায় অবস্থায় কবি মধুসূদনের জীবনে ঘটেছিল তার মহত্বের পরিচয়লাভে, তাই মধুসূদন দীনের বন্ধু আখ্যায় তাকে ভূষিত

তার কাছে ধর্ম ছিলো মানবধর্ম, এই দেশের কত মানুষ যে তার কাছে কত ভাবে ঋণী তা বোঝবার অপেক্ষা রাখে না, তিনি ছিলেন দয়ার সাগর।

বিদেশে অসহায় অবস্থায় কবি মধুসূদনের ভাগ্যে ঘটেছিল অনেক মহত্বের পরিচয়লাভে, তাই মধুসূদন দীনের বন্ধু আখ্যায় তাকে ভূষিত করের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

১৮৯১ খ্রী ২৯শে জুলাই আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মানবতার পূজারীর পরলোক প্রাপ্তির সাথে সাথে উনবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান ঘটলো। বাঙালি তার আদর্শ সন্তানকে

হারাল। বাঙালি এক অন্যতম প্রতিভাবান মানুষকে হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু মনুষ্যত্বের অনির্বান আলোকে বাঙালি চিত্তে তিনি এখনো দীপ্যমান।

সমগ্র ভারতবর্ষ তার অবদান কোনোদিন ভুলবে না। চিরকাল মানুষের মনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য হয়ে থাকবে, কিন্তু মনুষ্যত্বের অনির্বান আলোকে বাঙালি চিত্তে তিনি এখনো দীপ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক websites:—

.https://bnmwikipedia.org/wiki

https://en-m-wikipedia-org

https://kolam.org/

সহায়ক বইয়ের কিছু নাম:—

জানা অজানা

- পৃথ্বীরাজ সেন

প্রকাশিত কলকাতা, মাইতি বুক হাউস 2019

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 2017